পবন কাহিনী মূল বিষয় মাদক ব্যবসা

খোন্দকার তানভীর জামিল

মাত্র ৪ টাকার জন্য ৫ রাউন্ড বুলেট খরচ করে শেষ পর্যন্ত জেল হাজতে গেছে জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের কনিষ্ঠপুত্র খন্দকার আকতার হামিদ খান পবন। তবে জেলের অভ্যন্তরে হাসপাতালে ভিভিআইপি আসামি কাম রোগী হিসেবে পবনকে জামাই আদরেই রাখা হয়েছে। এছাড়া পুরান ঢাকার পবন বাহিনী এবং মানিকগঞ্জের ঘিওর-দৌলতপুরের বাতাস বাহিনীর কোনো সন্ত্রাসীকে এখন পর্যন্ত র‍্যাব-পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। অথচ সন্ত্রাসীদের নিয়ে এসব প্রাইভেট বাহিনী গঠন করে এ দুটি এলাকায় গত তিন বছরে পবন সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা এমন কি নারী নির্যাতনেরও ঘটনা ঘটিয়েছে বলে স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ। পবনের অবর্তমানেও তার বাহিনীর ক্যাডাররা এসব অপকর্ম ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কেউই মুখ খুলতে চাইছে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য পবন ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর অপকর্মের ফিরিস্তি চাপা থাকেনি। ফাঁস হয়ে গেছে প্রতিমাসে অবৈধভাবে ৪০ লাখ টাকা আয়ের নানা ঘটনা। তবে এসব অপকর্মের জন্য নয়, বরং পুরনো ঢাকার এক কমিশনারের সঙ্গে বিরোধে এক তুচ্ছ ঘটনায় গুলি করে ফেঁসে গেছে চিফ হুইপ পুত্র পবন।

আবারো মোবাইল কেলেঙ্কারি

গত আওয়ামী লীগ সরকার আমলে মিরপুরের আওয়ামী সাংসদ কামাল মজুমদারের পুত্র জুয়েল ও তার বাহিনী একটি মোবাইল ফোন সেটের জন্য বনানীতে দিনে-দুপুরে গুলি করে হত্যা করেছিল। তরুণ ফোন ব্যবসায়ী শিপুকে। এরপর থেকে ধনাঢ্য পিতার বখাটে সন্তান জুয়েল আজো পলাতক। আর এবার মোবাইল ফোনের বিল নিয়ে গুলি করে ধরা পড়েছে বর্তমান জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে পবন।

গত ২৩ বছর ধরে পুরনো ঢাকার আরমানিটোলার ১০৩ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের 'সাহেরা ভিলা' নামের বাড়িতে খন্দকার দেলোয়ার হোসেন সপরিবারে বসবাস করছেন। চিফ হুইপের এই বাসায় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে কয়েকজন পুলিশ। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে এদেরই একজন ১৩৬/১৩৭ নং বংশাল রোডস্থ 'সিম টেলিকম' নামের একটি পাবলিক টেলিফোন বুথে মোবাইল ফোনে কথা বলতে যায়। কথা শেষে বিল পরিশোধ নিয়ে ওই দোকানের মালিক মোহাম্মদ আলমগীরের সঙ্গে তার তর্কাতর্কি হয়। ওই পুলিশ সদস্য বাড়িতে ফিরে এসে এ ঘটনা চিফ হুইপ পুত্র পবনকে জানায়। বেলা ৩টার দিকে পবন বাসার ৩ পুলিশ সদস্য আসলাম, আমির ও কামরুজ্জামানকে নিয়ে ওই টেলিফোন দোকানে যায়। এবং মোবাইলের বিল ৮ টাকার পরিবর্তে ১২ টাকা কেন রাখা হয়েছে তা জানতে চায়। এ সময় তারা ৪ টাকা ফেরত দিতে বলে। দোকানি আলমগীর তা দিতে অস্বীকার করলে ক্ষিপ্ত হয়ে পবন কোমর থেকে পিস্তল বের করে তাকে লক্ষ্য করে দুই রাউন্ড গুলি করে। আলমগীর মেঝেতে শুয়ে পড়লে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এরপর পবন দোকান থেকে বের হয়ে সিম টেলিকমের গ্লাসে আরো তিন রাউন্ড গুলি করে বীরদর্পে চলে যায়। এ সময় অদূরে মাহুতটুলি ফাঁড়ির সামনে দাঁড়ানো পুলিশ ঘটনাস্থলে না এসে পবনকে গুলি করতে দেখে উল্টো দৌড়ে ফাঁড়ির ভিতের ঢুকে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ওইদিনই কোতোয়ালী থানায় একটি হত্যা চেষ্টা মামলা দায়ের করেন টেলিফোন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ আলমগীর। ৩০৭/৩৪ দন্ডবিধিতে দায়ের করা মামলার নং ৪৮,২৫/০২/০৫। তবে বিভিন্ন মহলের চাপের মুখে এজাহারে পবনের নাম উল্লেখ করা হয়নি।

এই ঘটনায় সরকারি মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয় উচ্চ মহল থেকে। এ প্রসঙ্গে এডিসি ডিবি সাংবাদিকদের জানান, 'মামলার একাধিক তদন্তে ও সাক্ষ্য প্রমাণে জানা গেছে পবন সেদিন সিম টেলিকম দোকানের মালিককে লক্ষ্য করে গুলি করেছিল।' এর পরপরই সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য সবুজ সঙ্কেত দেয়া হয়। নির্দেশ পেয়েই কোতোয়ালি থানার ডিবি পুলিশের টিম অভিযানে নামে। এ যৌথ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় সংশ্লিষ্ট থানার এসআই মাহবুবুর রহমান। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত পৌনে ৯টার দিকে আরমানিটোলার ১৭/২ গোবিন্দ দাস লেনস্থ একটি ফাস্ট ফুডের দোকান থেকে পবনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং সেখান থেকে তাকে একটি সাদা মাইক্রোবাসে চাপিয়ে মিন্টুরোডের ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ, পবনকে গ্রেপ্তারের সময় পবন বাহিনীর সন্ত্রাসীরা সেখানে অবস্থান করলেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি। তাই তারা এটাকে সরকারের 'লোক দেখানো নাটক' বলে মন্তব্য করেছে।

ডিবি অফিসে পবনকে নেয়ার পর কোতোয়ালি থানার মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ডিবি ইন্সপেক্টর রুহুল আমীনকে মামলার তদন্ত ভার দেয়া হয়। তিনি ১ মার্চ পবনকে আদালতে পাঠিয়ে এক তদন্ত প্রতিবেদনে বলেন, 'পবন তার কয়েক জন সহযোগীকে নিয়ে বাদীকে হত্যার জন্য গুলিবর্ষণ করে। তার কাছে অবৈধ অস্ত্র আছে। অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের জন্য তাকে রিমান্ডে নেয়া প্রয়োজন।' তিন দিনের রিমান্ড চাওয়া হলেও আদালত একদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

কিন্তু পবনকে জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের পরও পুলিশ কোনো অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। এমন কি তার ব্যবহৃত অস্ত্রটি কোথায় রাখা হয়েছে, সে ব্যাপারেও কোনো তথ্য পায়নি। বরং পবন ঘটনার সঙ্গে তার সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করেছে। পুলিশ অবশ্য জানতে পেরেছে যে পবনের ব্যবহৃত অস্ত্রটি লাইসেন্সকৃত হলেও তার নিজের নামে নয়। এ অস্ত্রটি সাধারণত তার কাছেই থাকে এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে তা ব্যবহার করা হয়। অভিযোগ রয়েছে, ডিবি কার্যালয়ে জামাই আদরে জিজ্ঞাসাবাদের ফলেই চিফ হুইপ পুত্র পবনের কাছ থেকে কোনো তথ্য পায়নি পুলিশ। এমনকি একদিন রিমান্ড শেষে ৩ মার্চ তাকে আদালতে হাজির করার পর আরো জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুনরায় রিমান্ড না চেয়ে পবনকে কারাগারে পাঠানোর আবেদন জানানো হয় পুলিশের পক্ষ থেকে। এ সময় পবনের আইনজীবীদের জামিনের আবেদন করলে আদালত তা না-মঞ্জুর করে তাকে

কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। সর্বশেষ এই প্রতিবেদন ছাপা হওয়ার আগে জানা গেছে ৭ মার্চ পবনের জামিন হলেও আটকাদেশের কারণে কারাগার থেকে সে বের হতে পারেনি।

অবৈধ আয়ের মূল উৎস : মাদক ব্যবসা

চিফ হুইপ পুত্র পবনকে জেলে পাঠানো হলেও তার বাহিনীর সদস্যরা পুরনো ঢাকায় বহাল তবিয়তেই অবস্থান করছে। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, তার সহযোগীরা আরমানিটোলা মাজার এলাকায় অভিনব স্টাইলে ফেনসিডিলের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

আরমানিটোলা আহমেদ বাওয়ানী স্কুলের বামপাশে মাজার গলি। এই মাজারের সামনেই মাসুম ভ্যারাইটিজ স্টোর। এর মালিক সোহেল ওরফে ফেন্সী সোহেল ও নাদিম দুই আপন সহোদর। এখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রির আড়ালে চলে রমরমা ফেনসিডিল ব্যবসা। প্রায় ৬ ঘণ্টা এ দোকানের আশপাশে অবস্থান করে, নানা বয়সী কিশোর, যুবক, মধ্যবয়স্ক যুবক এমনকি তরুণীদের আনাগোনা দেখা গেছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, এখানকার মরণনেশা ফেনসিডিলের পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় মাসে ৮০ লাখ টাকা হাত বদল হয়। দুই বছর আগে চিফ হুইপ পুত্র পবন এখানে মাদক স্পট চালু করে। এ ব্যবসার প্রধান মালিক পবন। আর অন্য মালিকরা হচ্ছে, ফেন্সী সোহেল, মাসুম ভ্যারাইটি স্টোরের ডানপাশের বাড়ির 'লালা' ও মাজারের বাম পাশের বাড়ির বাসিন্দা আলী।

মাদকাসক্ত যুবকরা এখানে এসে যোগাযোগ করে ফেন্সী সোহেলের সঙ্গে। তার কাছে ফেনসিডিলের দাম ধরিয়ে দেয়ার পর সোহেলের ইশারায় দোকানের কর্মচারী সাহেদ ওরফে ধাননু গুদাম থেকে 'মাল' নিয়ে আসে। এই ফেনসিডিলের গুদামটি হচ্ছে, মাজারের অদূরে বামপাশের গলিতে লোহার দরজা লাগানো একটি কাগজের কারখানা। ২০ ভাগ ফেনসিডিল নিচে এবং ৮০ ভাগ রাখা হয় কারখানার ছাদের ও চিলেকোঠায়। গুদাম থেকে ধাননু ফেনসিডিল নিয়ে আসে কোমরে গুঁজে। আর মাদকাসক্তরা সোহেলের দোকানে বসেই তা সেবন করে থাকে।

প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এখানে ফেন্সী সোহেল, ধাননু, লালা, আজম এভাবে ফেনসিডিল বিক্রি করে থাকে। এরপর প্রায় ২০০ বোতলের একটি চালান গুদাম ঘর থেকে বের করে। বিক্রির জন্য দেয়া হয় স্থানীয় চৌধুরী বাড়ির দারোয়ান রাব্বানী ও নজরুলকে। তারা ফেনসিডিলের বোতল গাড়ি পার্কিংয়ের বিভিন্ন স্থানে, গ্রিল দিয়ে ঘেরা মোটর রুমে, বিছানার নিচে, পানির কলসি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। রাব্বানী ও নজরুল রাত ১০টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত ফেনসিডিল বিক্রির দায়িত্বে থাকে। এজন্য তাদেরকে প্রতি বোতল বিক্রির জন্য দেয়া হয় ৩০ টাকা করে। উল্লেখ্য, বর্তমানে প্রতি বোতল ফেনসিডিলের দাম ২৫০ টাকা।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিন রাত ১১টার দিকে চিফ হুইপ পুত্র পবন ফেনসিডিল বিক্রি বাবদ তার লাভের টাকা নিয়ে যায়। আর হপ্তা হিসেবে টাকা নেয় অন্যতম ব্যবসায়িক পার্টনার 'লালা'।

এই স্পটে ফেনসিডিলের চালান আসে কুমিল্লা থেকে। কুমিল্লার রফিক, বংশালের ইয়াকুব ও জেনারেটর জসিম এই মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। প্রায় প্রতিদিনই এখানে কুমিল্লার সীমান্ত এলাকা থেকে ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যানে করে ফেনসিডিলের চালান আসে। তবে সবচেয়ে বড় চালানটি আসে প্রতি বৃহস্পতিবার। জানা গেছে, ওই চালানে কমপক্ষে ১০ হাজার বোতল ফেনসিডিল থাকে। যার বিক্রি মূল্য ২৫ লাখ টাকা। মূলত এই চালানের বড় অংশটি পাইকারি দরে ঢাকার বিভিন্ন স্পটে বিক্রি করা হয়।

এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মাদকাসক্তরা এখান থেকে ফেনসিডিল পাইকারি দরে কিনে তারা নিজ নিজ মহল্লায় বিক্রি করে থাকে। মূলত আরমানিটোলার এই মাদক স্পট বর্তমানে ঢাকায় ফেনসিডিল বিক্রির একটি অন্যতম পাইকারি আড়তে পরিণত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ফেনসিডিলের চালান নামানোর সময় নবাবপুরের আলমগীর, ইয়াকুবসহ পবনের ক্যাডার বাহিনী মোটর সাইকেল করে চারদিকে টহল দিয়ে থাকে। অভিযোগ রয়েছে চিফ হুইপ পুত্র পবনের কারণে আজ পর্যন্ত স্থানীয় থানা পুলিশ, র‍্যাব কিংবা মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ভুলেও এই মাজার গলির ফেনসিডিল স্পটে অভিযান চালায়নি। এদিকে মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতার দরুন স্থানীয় কিশোর-যুবকরা ফেনসিডিলে আসক্ত হয়ে পড়েছে। আর মাদকের টাকা জোগাড় করতে অনেকেই পবন বাহিনীতে যোগ দিয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা শুরু করেছে। এছাড়া হঠাৎ করেই আরমানিটোলা এলাকায় চুরি, রাহাজানি, বিশেষ করে মোবাইল ছিনতাই বেড়ে গেছে। মাজার গলির মাসুম ভ্যারাইটি স্টোরের পাশেই খুলে বসা হয়েছে 'শওকত মোবাইল হাসপাতাল'। মাদকাসক্তরা ছিনতাই করা মোবাইল এখানে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে। সেই টাকায় কেনা মরণনেশা ফেনসিডিল আকণ্ঠ পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে থাকে। যে দোকানে এই ফেনসিডিল বেচাকেনা হয়, সেই দোকানের ভাড়া বাবদ প্রতি মাসে মালিক আকবরকে দেয়া হয় ১ লাখ ১০ হাজার টাকা। এছাড়া এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের যেকোনো পণ্য ফ্রি অথবা নামমাত্র মূল্যে তার কাছে বিক্রি করা হয়। ফলে সে সবকিছুই দেখেও না দেখার ভান করে থাকে বলে স্থানীয় জনসাধারণের অভিযোগ।

পবনের ক্যাডার বাহিনী

চিফ হুইপের স্ত্রী খন্দকার সাহেরা হোসেনের প্রশ্রয়ে এবং বড় ভাই খন্দকার আব্দুল হামিদ খান ডাবলুর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ধরেই পবন সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে আসছে। বিগত আওয়ামী লীগ আমলে ২০০০ সালের ৬ সেপ্টেম্বর পুরান ঢাকায় চাঁদাবাজি করতে গেলে তাকে গণপিটুনী দিয়ে পুলিশে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পরেই সে জামিনে বেরিয়ে আসে। বিভিন্ন চাপের মুখে পড়ে তাকে আমেরিকায় পাঠানো হলেও অল্পদিন থেকেই সে দেশে ফিরে আসে। সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে, বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের দুই পুত্র ডাবলু ও পবন পুরান ঢাকার কেমিক্যাল মার্কেটে অবৈধভাবে মিথানল স্পিরিট বিক্রি করতো।

জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তারা আরো বড় ধান্ধায় নেমে পড়ে। বড়ভাই ডাবলু সোনারগাঁও রোডের হাতিরপুল বাজারের কাছে গড়ে ওঠা মোতালেব প্লাজা মার্কেটের মালিক সমিতির সভাপতি ও ছোটভাই পবন সমাজ কল্যাণ সম্পাদক বনে যায়। এর ফলে তারা প্রায়ই নানা অজুহাতে দোকান মালিকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আর পবন পুরান ঢাকা ও মানিকগঞ্জে পুরোদমে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও জমি দখলে নেমে পড়ে। গড়ে তুলে পবন বাহিনী। এ সন্ত্রাস বাহিনীতে তার সহযোগিরা হচ্ছে, সাইফুল, নাহিদ, লিংকন, দিদার, সোলেমান, রাজীব, ঝন্টু, মাইনু, বুলবুল, পেয়ারা মকবুল, পান্না, মোস্তফা, জাহাঙ্গীর, রিপন ও গোয়া হাবীব। এছাড়া পুরান ঢাকার যুবদল নেতা হাজী কামাল পবনের চাঁদাবাজির অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহযোগী। কয়েক বছর আগে শাবিস্তান সিনেমা হল বিক্রির সময় হাজী কামাল ২০ লাখ টাকা চাঁদা নেয় বলে অভিযোগ আছে।

আরমানিটোলায় বিক্রমপুর ট্রান্সপোর্টের মালিক আসাদুর রহমান আসাদ চিফ হুইপ পুত্র পবনের অন্যতম বুদ্ধি ও পরামর্শদাতা। মরহুম হাজী রমজান আলীর পুত্র আসাদ ছিল পুরান ঢাকার ত্রাস আকবর শেঠ হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। কিন্তু আসাদ, নাইরুম ও নীমতলীর আতাউরসহ এ হত্যা মামলার অধিকাংশ আসামি আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পায়। তবে ১৯৯৪ সালে এদের মধ্যে নিমতলীর আতাউর রহমানকে কোলকাতায় নিয়ে যায় আসাদ এবং সেখানকার সন্ত্রাসী চুন্নু ও বাবুলের সহায়তায় তাকে হত্যা করে বলে অভিযোগ রয়েছে। আরমানিটোলার ৯৬ নম্বর শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের ইমাম উদ্দিনের ছেলে নাহিদ, চিফ হুইপ পুত্র পবনের আরেক ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ২০০২ সালের অপারেশন ক্লিনহার্ট চলাকালে আর্মির হাতে সাভারে বুলবুল ও মিনু নামের দুই সহযোগী গ্রেপ্তার হলেও পবন পালিয়ে যায়। এরপর সে এই নাহিদের বাসায়

এসে আত্মগোপন করে বলে ওই গলির প্রত্যক্ষদর্শী বাসিন্দারা ২০০০কে জানিয়েছেন। এছাড়া এই নাহিদের বাসায়ও মাঝেমধ্যে ফেনসিডিলের চালান রাখা হয় বলে জানা গেছে। মূলত এই মাদক ব্যবসাই চিফ হুইপের কনিষ্ঠপুত্র পবনের অবৈধ আয়ের মূল উৎস। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষকের ভাষায়, 'ফেনসিডিল ইজ দ্য সিক্রেট অব মাই ইনকাম সোর্স'!

সন্ত্রাস ও প্রতিবাদের ধরন

পবন বাহিনী গত বছরের ২৮ জুলাই বিকেল সাড়ে ৫টার দিয়ে চিফ হুইপের বাসার অদূরে অবস্থিত খাজা আয়রন মার্কেটে গিয়ে ব্যবসায়ী মোঃ সেলিমের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা চায়। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে সন্ত্রাসীরা তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যায় শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডের নির্মাণাধীন অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানে তার দুই কানে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করা হয়। ফলে তার কানের পর্দা ফেটে যায়। তিন ঘণ্টা বেধড়ক মারধরের এক পর্যায়ে মোঃ সেলিম ৩০ হাজার টাকা চাঁদা দিতে রাজি হলে রাত সাড়ে ৮টায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এরপর পবন বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনে মারাত্মকভাবে আহত ব্যবসায়ী সেলিমকে নিউ ঢাকা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। তাকে সেখানে থাকতে হয় ৭ দিন। এরপর বাড়ি ফিরে গত ৫ আগস্ট কোতোয়ালি থানায় মামলা (নং-১০) দায়ের করেন। দ্রুত বিচার আইন '০২-এর ৪(১) ধারায় দায়ের করা এ মামলায় উল্লিখিত সন্ত্রাসীদের আসামি করা হয়।

খাজা আয়রন মার্কেটে পবন বাহিনীর সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির ঘটনার ওপর সাপ্তাহিক ২০০০-এর সেপ্টেম্বর '০৪ সংখ্যায় 'এক্স-ফাইল চিফ হুইপপুত্র পবন' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর আগে ৭ সেপ্টেম্বর দুটি জাতীয় দৈনিকে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। আর ওই বিজ্ঞাপন দেখে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার একদিন আগে ৭ সেপ্টেম্বর বিকেলে চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের ছেলে খন্দকার আকতার হামিদ খান পবন তার দুই ক্যাডারসহ সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে এসে রিপোর্টারদের খোঁজ করতে থাকেন এবং হুমকি প্রদান করেন। নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত রক্ষীকে ধমক দিয়ে বলেন, 'আমি চিফ হুইপের পুত্র পবন'। প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পরে অবশ্য তিনি দায়সারা গোছের একটি প্রতিবাদলিপি পাঠান।

এদিকে পুত্রের কুকীর্তি ঢাকতে পত্রপত্রিকায় বিবৃতি দিতে আরম্ভ করেছেন চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ার হোসেন। জাতীয় সংসদের নিজস্ব প্যাডে স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে তিনি দাবি করেছেন, 'অপ্রমাণিত ও অনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রতিবেদনের মাধ্যমে তাকে রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হচ্ছে, তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্যে কালিমা লেপন করা হচ্ছে।' তিনি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনকে অবস্তুনিষ্ঠ উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায় নির্বিচারে তিনিসহ তার স্ত্রী-সন্তানদের সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ বানানোর অবস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। চিফ হুইপ বলেন, 'বিভিন্ন কুচক্রী মহলের আশকারায় ও বিভ্রান্তিকর রিপোর্টিংয়ে অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় আমার বাসায় অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান চালানো হলেও তথাকথিত অবৈধ অস্ত্র পাওয়া যায়নি।' প্রতিবাদপত্রে তিনি আরো বলেন, 'বাংলাদেশের আইন-আদালত খোলা আছে জন্মলগ্ন থেকে। কিন্তু আজ অবধি বাংলাদেশের কোথাও পবনের নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগে কোনো মামলা আছে বলে জানা নেই।'

প্রকৃতপক্ষে প্রভাবশালী পিতার পুত্র হওয়ার কারণেই পুরান ঢাকার স্থানীয় জনসাধারণ পবনের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারছেন না। এ প্রসঙ্গে গত বছর পবন বাহিনীর হাতে নির্যাতিত খাজা আয়রন মার্কেটের ব্যবসায়ী সেলিম ২০০০-কে বলেছিলেন, বিভিন্ন মহলের চাপের মুখেই আমি মামলার আসামি হিসেবে চিফ হুইপের পুত্র পবনের নাম এজাহারে লিখতে পারিনি। তাছাড়া আমাকে চিফ হুইপের নির্মাণাধীন সাহেরা টাওয়ারসে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করা হলেও সে কথা আমি এজাহারে উল্লেখ করতে পারেনি। তার মামলার এজাহারে বলা হয়, 'আসামিরা এলাকায় নামধারী সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ। তাদের ভয়ে কেউ মুখ খোলে না। আসামিরা স্থানীয় পবনের নেতৃত্বে এ ধরনের কর্মকান্ড করে থাকে।'